পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রমাণ ও মুজিজার বিশ্বকোষ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

বৈজ্ঞানিক মুজিজা · ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য · সত্য হয়ে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদ · জিন, জাদু ও অদৃশ্যের জগৎ

শিশুও বুঝতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা · 157টি রঙিন চিত্র

157টি প্রমাণ, শক্তি অনুসারে সাজানো

তৃতীয় পর্ব

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদসমূহ

যেসব পাঠ আজও আহলে কিতাবের নিজেদের গ্রন্থে লেখা রয়েছে, আর যেগুলো আগামী এক নবির বর্ণনা দেয় — যাঁর গুণাবলি সমগ্র ইতিহাসে কেবল একজন মানুষের সঙ্গেই মেলে, আর অন্য কারও সঙ্গে নয়।

11 প্রমাণ

101 তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মতো এক নবি

আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মতো একজন নবি দাঁড় করাব, আর আমার কালাম তার মুখে দেব; আর আমি তাকে যা আদেশ করব, সে তাদের তা-ই বলবে।

দ্বিতীয় বিবরণ — অধ্যায় 18, আয়াত 18

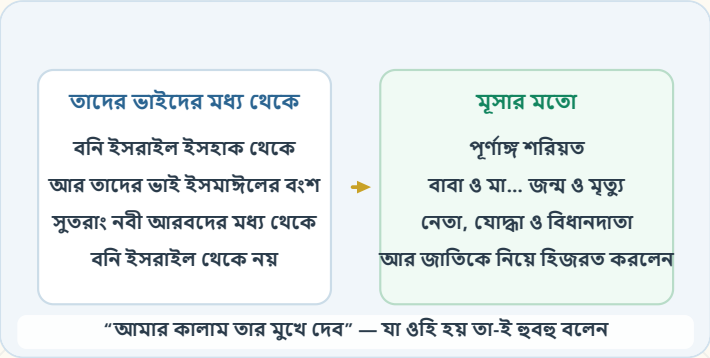

একটি পাঠেই তিনটি শর্ত: ভাইদের মধ্য থেকে, মূসার মতো, আর যা তাঁর মুখে দেওয়া হবে তা-ই বলবেন

সহজ কথায়

আল্লাহ মূসাকে আগামী এক নবির ওয়াদা দিচ্ছেন, যাঁর তিনটি গুণ: তিনি হবেন বনি ইসরাইলের **ভাইদের** মধ্য থেকে, তাদের মধ্য থেকে নয়; তিনি হবেন **মূসার মতো**; আর তিনি **সেই কালামই বলবেন যা তাঁর মুখে রাখা হবে**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইহুদিরা শত শত বছর ধরে এই নবির অপেক্ষা করেছে, আর যিনিই আবির্ভূত হয়েছেন তাঁকেই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। যোহনের সুসমাচারে আছে, তারা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞাসা করল: "আপনি কি এলিয়?" তিনি বললেন, না। "আপনি কি **সেই নবি**?" তিনি বললেন, না। — এতে বোঝা গেল, "সেই নবি" ছিলেন অপেক্ষিত এক নির্দিষ্ট তৃতীয় ব্যক্তি, মসীহও নন, এলিয়ও নন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

তাওরাতের ভাষায় "**তাদের ভাইয়েরা**" অর্থ চাচাতো ভাই, এক পিতার ছেলে নয় — বনি ইসরাইল ইসহাকের বংশ, আর তাদের ভাইয়েরা ইসমাঈলের বংশ, অর্থাৎ আরবরা। আর "**তোমার মতো**"—এর সূক্ষ্ম তুলনা মুহাম্মদ ﷺ-কেই দেয়: তিনি মাতা-পিতা থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মেছেন, বিয়ে করেছেন ও সন্তান হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ এক শরিয়ত এনেছেন, নিজ জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন ও শাসন করেছেন, নিজ শহর থেকে হিজরত করেছেন, আর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। আর দ্বিতীয় বিবরণ নিজেই শেষ করে: "**মূসার মতো কোনো নবি ইসরাইলে আর দাঁড়ায়নি**" (34:10) — এতে বনি ইসরাইলের সব নবিই তুলনা থেকে বাদ পড়ে যান।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

তৃতীয় শর্তটিই নির্ণায়ক: "**আর আমার কালাম তার মুখে দেব, আর আমি তাকে যা আদেশ করব সে তাদের তা-ই বলবে**"। এ হলো এমন এক নবির বর্ণনা যিনি **অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়ে দেওয়া পাঠ** উচ্চারণ করেন, তার ভাবার্থ নয়। আর কুরআনের বর্ণনা ঠিক এটিই: "**আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না; তা তো কেবল ওহি, যা পাঠানো হয়**"। আর মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর সর্বপ্রথম যা নাজিল হয়েছিল তা ছিল গ্রহণ করার সরাসরি আদেশ: "পড়ুন।" এরপর বাইবেলের পাঠটি শেষ হয় কঠিন এক সতর্কবাণীতে: "আর এমন হবে যে, আমার নামে সে যে কথা বলবে তা যে ব্যক্তি শুনবে না, আমি তার কাছে তার হিসাব নেব।" সুতরাং এটি কেবল সুসংবাদ নয়, বরং **অনুসরণের বাধ্যবাধকতা**।

যদি বলা হয়: 15 নম্বর আয়াতে তো আছে "তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদের মধ্য থেকে" — উত্তর এই যে, 18 নম্বর আয়াত পরোক্ষ সর্বনামে "**তাদের ভাইদের**"-এ সরে আসে; আর দ্বিতীয় বিবরণ নিজেই অন্য এক জাতিকে ভাই বলে: "**তোমাদের ভাই এষৌর সন্তানরা**" (2:4)। আর বনি ইসরাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হলে ব্যতিক্রম যোগ করা হতো, যেমন বাদশাহর ব্যাপারে যোগ করা হয়েছে: "কোনো বিদেশি নয়, যে তোমার ভাই নয়" (17:15)।

১০২ আর তিনি ফারান পর্বত থেকে ঝলমল করে উঠলেন

প্রভু সিনাই থেকে এলেন, আর সাঈর থেকে তাদের ওপর উদিত হলেন; তিনি ফারান পর্বত থেকে ঝলমল করে উঠলেন, আর দশ হাজার পবিত্রজনের সঙ্গে এলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ — অধ্যায় 33, আয়াত 2

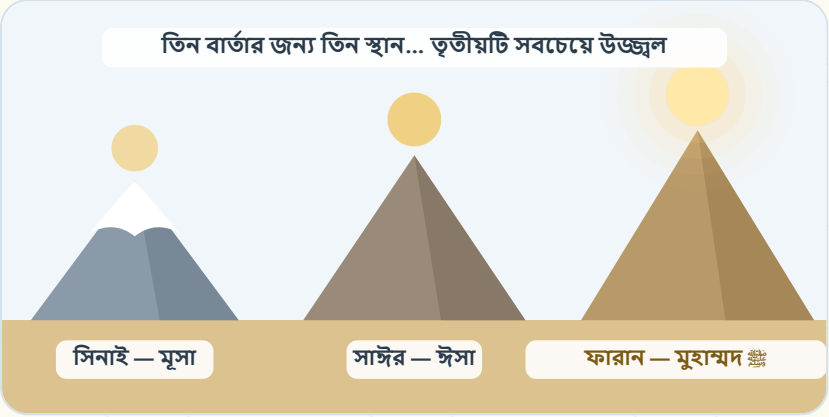

আলোর তিনটি স্তর: তিনি উদিত হলেন... তারপর ঝলমল করে উঠলেন

সহজ কথায়

তাওরাতের একটি পাঠ ক্রমানুসারে তিনটি পর্বতের নাম নেয়: **সিনাই**, যেখানে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বলেছেন; তারপর **সাঈর** — ইদোমের পর্বতমালা, যার উদয়কে মসীহ আলাইহিস সালামের বার্তার ওপর ধরা হয় — তারপর **ফারান**। আর ফারান — স্বয়ং তাওরাতের পাঠ অনুসারে — সেই ভূমি যেখানে ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরেরা বসতি করেছিলেন: মক্কা ও তার চারপাশ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের গ্রন্থে এই পাঠ পড়ে আসছে। আর যে সমস্যার সমাধান তাদের কাছে আজও হয়নি: **তৃতীয় ঘটনাটি কী?** প্রভুর সিনাই থেকে আসা মানে তাওরাত, আর সাঈর থেকে তাঁর উদিত হওয়া মানে ইনজিল — তাহলে ফারান থেকে কী ঝলমল করে উঠল? ওই অঞ্চলে আগের দুটির সমকক্ষ কোনো ধর্মীয় ঘটনা ঘটেইনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ফারান স্বয়ং তাওরাতেই একটি নির্দিষ্ট স্থান। আদিপুস্তকে (21:21) ইসমাঈল সম্পর্কে এসেছে: "**আর তিনি ফারানের প্রান্তরে বসতি করলেন, আর তাঁর মা মিসর দেশ থেকে তাঁর জন্য একজন স্ত্রী নিলেন।**" সুতরাং তাদেরই পাঠ অনুসারে এটি ইসমাঈলের বংশধরদের আবাসভূমি। মুসলিম ভূগোলবিদগণ এবং বাইবেলের অভিধানগুলো ফারানের প্রান্তরকে উত্তর হিজাজ, সিনাই উপদ্বীপ ও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী ভূমিতে নির্দেশ করে। আর ওই প্রান্তর থেকে বিশ্বজনীন বার্তাবাহী কোনো নবি বের হননি, একমাত্র মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

অর্থের জায়গাটি ক্রিয়াগুলোর ক্রমবৃদ্ধিতে, আর হিব্রুতে তা ইচ্ছাকৃত: "**এলেন**", তারপর "**উদিত হলেন**", তারপর "**ঝলমল করে উঠলেন**" — আর ঝলমল করে ওঠাই সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে দূর-বিস্তৃত আলো। পাঠটি তিনটি বার্তাকে ঊর্ধ্বক্রমে সাজায় আর শেষটিকেই সবচেয়ে উজ্জ্বল করে। এরপর যোগ করে: "**তাঁর ডান হাত থেকে তাদের জন্য এক অগ্নিময় বিধান বের হলো**" — অর্থাৎ এই শেষ আগমনের সঙ্গে **একটি শরিয়ত** আছে, কেবল উপদেশ নয়। আর মূসার পরে পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত — ইবাদত, লেনদেন ও বিচার সবকিছুর বিধান — নিয়ে আসা একমাত্র নবি মুহাম্মদ ﷺ।

১০৩ পবিত্রজন ফারান পর্বত থেকে

আল্লাহ তাইমান থেকে এলেন, আর পবিত্রজন ফারান পর্বত থেকে। তাঁর মহিমা আকাশমণ্ডল ঢেকে দিল, আর পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পূর্ণ হলো।

হবক্কূক — অধ্যায় ৩, আয়াত ৩

ফারান পর্বত — তাওরাতের পাঠ অনুসারে ইসমাঈলের আবাসভূমি — নাম নিয়েছেন খ্রিষ্টপূর্ব যুগের এক হিব্রু নবি

সহজ কথায়

বনি ইসরাইলের একজন নবি বলছেন, পবিত্রজন আসবেন **ফারান পর্বত** থেকে — আর ফারান, স্বয়ং তাওরাতের পাঠ অনুসারে, সেই প্রান্তর যেখানে ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরেরা বসতি করেছিলেন। আর পাঠটি তার সঙ্গে জুড়ে দেয় ইদোমের প্রান্তে অবস্থিত **তাইমান**-কে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আহলে কিতাবের কাছে এই পাঠের ব্যাখ্যা কখনোই আয়ত্তে আসেনি। তাইমাও বনি ইসরাইলের ভূমির অংশ নয়, ফারানও নয়, আর তাদের ইতিহাসে এ দুই জায়গা থেকে কোনো নবি বেরই হননি। কেউ কেউ একে সিনাইয়ে আল্লাহর আগমনের কাব্যিক বর্ণনা হিসেবে পড়তে চেয়েছেন — কিন্তু এখানে সিনাইয়ের উল্লেখই নেই, অথচ ফারানের নাম ধরে উল্লেখ আছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

তাইমা আজ উত্তর-পশ্চিম সৌদি আরবের একটি প্রসিদ্ধ মরূদ্যান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নগরী, যা একসময় হিজাজ ও শামের মধ্যকার কাফেলা-পথের প্রধান বিরতিস্থল ছিল, আর যেখানে খ্রিষ্টপূর্ব যুগের ধ্বংসাবশেষ ও শিলালিপি রয়েছে। আর **ফারান** ইসমাঈলের সেই প্রান্তর, যেমনটি আদিপুস্তক বলেছে। সুতরাং পাঠটি ইদোম থেকে পুবে **ইসমাঈলের প্রান্তরের** দিকে সরে আসে — আর ওই প্রান্তর থেকে বিশ্বজনীন বার্তাবাহী কোনো নবি বের হননি, একমাত্র মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুটি বিষয় এই পাঠকে কাকতালীয়তার ঊর্ধ্বে তুলে দেয়। প্রথমত, এটি **ফারানের নাম নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবরণের পাঠের সঙ্গে মিলে যায়** — ভিন্ন দুই যুগের ভিন্ন দুই নবি একই স্থানের দিকে ইঙ্গিত করছেন। নিজেদের ভূমির বাইরের একটি জায়গার ওপর দুই স্বতন্ত্র সাক্ষীর মিলে যাওয়া প্রবল প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, পাঠের বাকি অংশ: "**আর পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পূর্ণ হলো**" — অর্থাৎ এই আগমনের প্রভাব **বিশ্বজনীন, স্থানীয় নয়**। আর ওই ভূমি থেকে এমন কিছু বের হয়নি যা পৃথিবীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে, একমাত্র ইসলাম ছাড়া — যার মাধ্যমে দিনের প্রতিটি ঘণ্টায় প্রতিটি মহাদেশে আজান ও তাসবিহ উচ্চারিত হয়।

104 কায়দারের জনপদ... আর সেলার অধিবাসীরা

> প্রান্তর আর তার নগরগুলো নিজেদের কণ্ঠ তুলুক, সেই জনপদগুলো যেখানে কায়দার বাস করে; সেলার অধিবাসীরা গান গাক, তারা পর্বতশিখর থেকে জয়ধ্বনি করুক।
>
> **যিশাইয় — অধ্যায় 42, আয়াত 11**

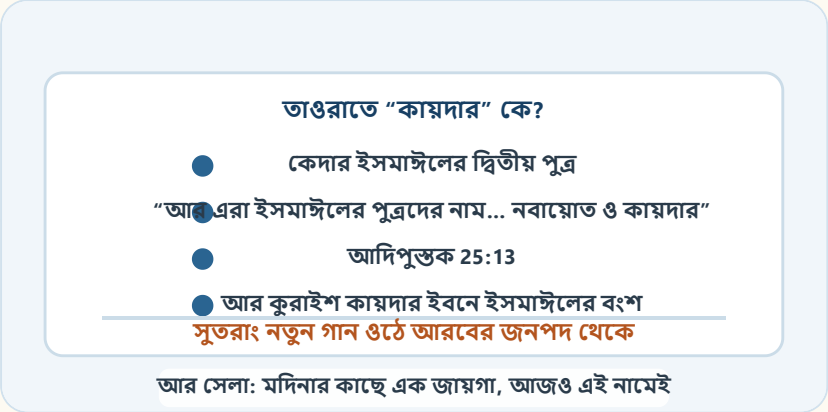

যিশাইয় কায়দারের জনপদগুলোকে নতুন গান গাইতে আহ্বান করছেন

সহজ কথায়

যিশাইয় বলছেন: প্রান্তর নিজের কণ্ঠ তুলুক, **সেই জনপদগুলো যেখানে কায়দার বাস করে**। আর কায়দার — তাওরাতের পাঠ অনুসারে — ইসমাঈলের পুত্র, আর আদনানি আরবদের পূর্বপুরুষ, যাঁদের মধ্যে কুরাইশও আছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

যিশাইয়ের বিয়াল্লিশতম অধ্যায় এমন এক "বান্দা"-র কথা বলে যাঁকে আল্লাহ মনোনীত করেন, যিনি জাতিগুলোর কাছে ন্যায়বিচার নিয়ে আসেন, আর যিনি পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত ক্লান্তও হন না, ভেঙেও পড়েন না। আহলে কিতাব তাঁর পরিচয় নিয়ে মতভেদ করে এসেছে। কিন্তু পাঠটি নিজেই **স্থান** নির্দিষ্ট করে দেয়: কায়দারের জনপদ আর সেলা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

"**কায়দার**"-এর নাম আদিপুস্তকে (25:13) ইসমাঈলের বারো ছেলের মধ্যে এসেছে। আর আদনানি আরবরা — যাঁদের মধ্যে কুরাইশ ও বনু হাশিম — তাঁরই বংশধর। আর উত্তর উপদ্বীপের অঞ্চলটিকে অ্যাসিরীয় শিলালিপিতে সত্যিই "কেদার" নামে ডাকা হয়েছে। আর "**সেলা**" (যা অনুবাদে "শৈল" করা হয়েছে) একটি পরিচিত স্থান: **সালা পর্বত**, যা মদিনার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, যার পাশে আহযাবের খন্দক খনন করা হয়েছিল, আর যা আজও সেই নামেই দাঁড়িয়ে আছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

অধ্যায়টি 1 নম্বর আয়াতে শুরু হয় "দেখো আমার বান্দা, যাঁকে আমি ধরে রেখেছি" দিয়ে — আর "বান্দা" সেই উপাধি যা কুরআনে মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে সঙ্গেই চলে: "পবিত্র তিনি, যিনি রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন **তাঁর বান্দাকে**", "আর যখন **আল্লাহর বান্দা** তাঁকে ডাকতে দাঁড়ালেন"। এরপর 10 নম্বর আয়াত বলে: "**প্রভুর উদ্দেশে নতুন গান গাও**" — অর্থাৎ নতুন এক শরিয়ত, পুরোনোর সংস্কার নয়। এরপর এই গানের মানুষদের চিহ্নিত করে: কায়দারের জনপদ আর সেলার অধিবাসীরা — **দুটিই নিখাদ আরব ভূখণ্ড**, একটি কুরাইশের বংশ আর অন্যটি মদিনার একটি পর্বত। একই পাঠে নবি ﷺ-এর বংশ, তাঁর হিজরতের শহর, তাঁর উপাধি "বান্দা", আর নতুন শরিয়তের আহ্বান — এতগুলোর একত্র হওয়া কাকতালীয়তার কোনো সুযোগ রাখে না।

105

যিশাইয়

গাধার আরোহী আর উটের আরোহী

তখন তিনি দেখলেন আরোহীদল — জোড়া অশ্বারোহী, গাধার আরোহীদল, উটের আরোহীদল; আর তিনি অতিশয় মনোযোগ দিয়ে কান পাতলেন।

যিশাইয় — অধ্যায় 21, আয়াত 7

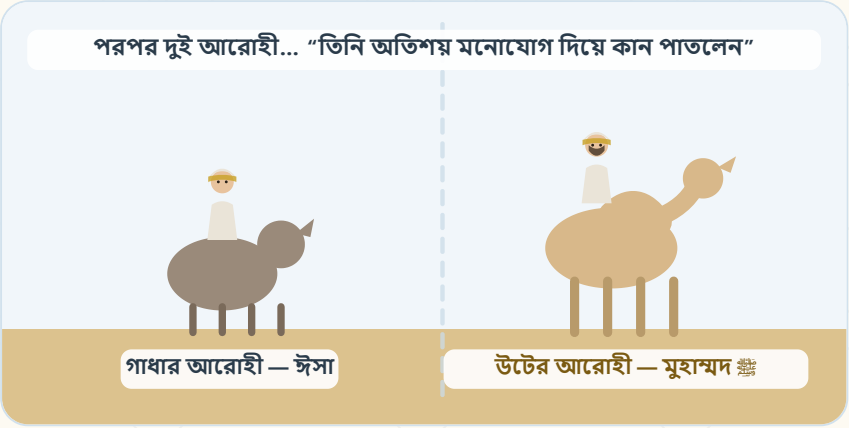

একটি পাঠ যা দুই নির্দিষ্ট আরোহীর নাম নেয় আর তাঁদের কথা শোনার আদেশ দেয়

সহজ কথায়

যিশাইয়ের পুস্তকের একটি দর্শন, যেখানে নবি **দুজন আরোহী** দেখেন: একজন গাধার ওপর আর অন্যজন উটের ওপর; আর তাঁকে আদেশ দেওয়া হয় যেন তিনি তাঁদের কথা গভীর মনোযোগে শোনেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আহলে কিতাবের কাছে এই পাঠের ব্যাখ্যা করা হয়েছে বাবিলের পতনের দর্শন হিসেবে। কিন্তু দৃশ্যটি নিজেই দৃষ্টি কাড়ে: দুজন স্বতন্ত্র আরোহী, যাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাঁদের বাহন দিয়ে, আর নবিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের কথা শুনতে — আর শোনা হয় কোনো বার্তার জন্য, যুদ্ধের সংবাদের জন্য নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

গাধার আরোহী সেই নিদর্শন, যা আহলে কিতাব মসীহ আলাইহিস সালামের জন্য চেনে। সখরিয় (9:9) বলে: "দেখো, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন... বিনম্র, আর গাধার ওপর আরোহী", আর সুসমাচারগুলো লিপিবদ্ধ করেছে যে মসীহ সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেই গাধায় চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। তাহলে প্রথমজন যদি মসীহ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাঁর পরে আসা **সেই উটের আরোহী** কে, যাঁর কথা শোনার আদেশ নবিকে ঠিক তেমনই দেওয়া হয়েছে যেমন প্রথমজনের কথা শোনার? উট আরবদের বাহন, আর মসীহের পরে উটওয়ালা কোনো জাতি থেকে কোনো নবি আসেননি, একমাত্র মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শক্তিটা **জোড় বাঁধা আর ক্রমে**। উটের আরোহীর উল্লেখ একা আসেনি যে কেউ বলবে এটি কোনো কাফেলার সাধারণ উল্লেখ — তাঁকে গাধার আরোহীর সঙ্গে একই দৃশ্যে, আর ঠিক তাঁর পরেই জোড়া হয়েছে। আহলে কিতাব মেনে নিয়েছে যে "গাধার আরোহী" একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নবুয়তি নিদর্শন — তাহলে একই পাঠে তাঁর সঙ্গীটি নিরর্থক কোনো খুঁটিনাটি হতে পারে না। আর শোনার আদেশ — "**আর তিনি অতিশয় মনোযোগ দিয়ে কান পাতলেন**" — জানায় যে যা আসছে তা **শোনার আর মানার মতো কথা**, দেখার মতো দৃশ্য নয়। আর অধ্যায়ের বাকি অংশে আছে "**আরব দেশ সম্পর্কে ভারবাণী**", আর দেদান ও তাইমার নাম, আর "**কায়দারের মহিমা**" — পুরো প্রসঙ্গটিই আরব।

106

যিশাইয়

আমি লেখাপড়া জানি না

আর সেই পুস্তক এমন একজনকে দেওয়া হয় যে লেখাপড়া জানে না, আর বলা হয়: অনুগ্রহ করে এটি পড়ুন; আর সে বলে: আমি লেখাপড়া জানি না।

যিশাইয় — অধ্যায় 29, আয়াত 12

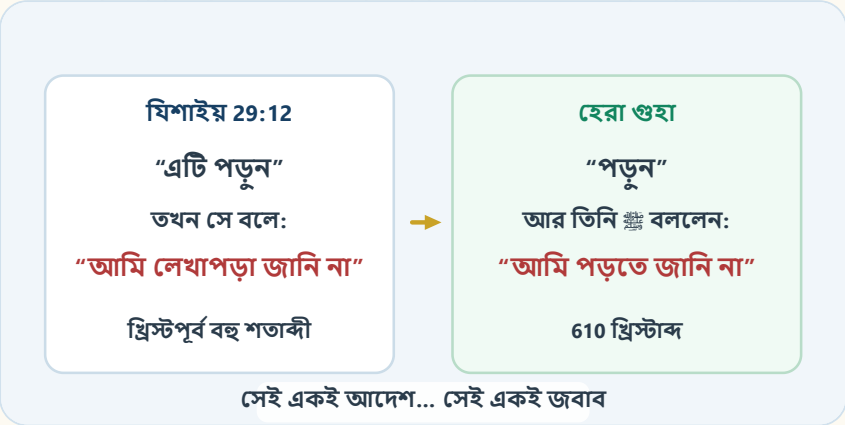

একটি দৃশ্য, যার বর্ণনা হয়েছে ঘটে যাওয়ার এক হাজার বছরেরও আগে

সহজ কথায়

যিশাইয়ের একটি পাঠ একটি দৃশ্যের বর্ণনা দেয়: একটি পুস্তক এমন এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয় **যে পড়তে পারে না**, আর তাকে বলা হয়: "এটি পড়ুন।" সে উত্তর দেয়: "আমি লেখাপড়া জানি না।" আর ঠিক এটিই ঘটেছিল হেরা গুহায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই পাঠ নবি ﷺ-এর জন্মের শত শত বছর আগে থেকেই আহলে কিতাবের গ্রন্থে ছিল, অথচ এর এমন কোনো বাস্তবায়ন ছিল না যার দিকে ইঙ্গিত করা যায়। তারা একে বনি ইসরাইলের নিজেদের কিতাব বোঝার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতীকী ইঙ্গিত হিসেবে পড়ত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হেরা গুহায়, 610 খ্রিষ্টাব্দে, জিবরাইল মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: "**পড়ুন**।" তিনি বললেন: "**আমি তো পড়তে জানি না**।" তিনি তাঁকে চেপে ধরলেন, তারপর বললেন: "পড়ুন।" তিনি বললেন: "আমি তো পড়তে জানি না" — তিন বার। এরপর নাজিল হলো: "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" ঘটনাটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণিত, আর সিরাতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোর একটি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মিলটি কেবল অর্থে নয়, বরং **গোটা দৃশ্যের গঠনে**: পড়ার আদেশ, অপারগতার উত্তর, আর তা-ও এমন একজনের কাছ থেকে যে পড়ে না। আর এর জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত লাগে: প্রতিশ্রুত নবি হবেন **নিরক্ষর, পড়েনও না লেখেনও না**। আর এটিই সেই গুণ, যা কুরআন মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলে আর যাকেই দলিল বানায়: "**আর আপনি এর আগে কোনো কিতাব পাঠ করেননি আর নিজ ডান হাতে তা লেখেননি; তা হলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহের সুযোগ পেত**।" লক্ষ করুন, এখানে নিরক্ষরতা কোনো ঘাটতি নয়, বরং **প্রমাণ**: তিনি যদি পড়ুয়া-লিখিয়ে হতেন, তবে বলা হতো তিনি নকল করেছেন আর টুকেছেন। আর যিশাইয়ের পাঠ সেই অপারগতাকেই নিদর্শন বানায়, ত্রুটি নয়।

পরমগীত

107 আর তিনি সর্বাংশে মাহামাদ্দিম

হিক্কো মামতাক্কিম ওয়া-কুল্লো মাহামাদ্দিম; জেহ দোদি ওয়া-জেহ রেঈ, বনোত ইয়েরুশালায়িম।

পরমগীত — অধ্যায় 5, আয়াত 16 (হিব্রু পাঠ)

মূল হিব্রু পাঠ

מַחֲמַדִּים

উচ্চারণ: মাহামাদ্দিম

আর অনুবাদে করা হলো: "সর্বাংশে মনোহর"

নাম মূল পাঠে আছে... অনুবাদে উধাও

হিব্রু শব্দটি ঠিক যেমন আজকের প্রামাণ্য সংস্করণগুলোতে দাঁড়িয়ে আছে

সহজ কথায়

পরমগীতের হিব্রু পাঠে **"মাহামাদ্দিম"** শব্দটি আসে — আর এর হিব্রু ধাতু ח-מ-ד সেই একই ধাতু যা আরবি হ-ম-দ, যা থেকে "মুহাম্মদ" ও "আহমদ" গঠিত। অনুবাদে একে করা হয় "সর্বাংশে মনোহর", আর এভাবেই ধাতুটি গলে যায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পরমগীত কাব্যিক চিত্রকল্পে একজন প্রিয়তমের বর্ণনা দেয়, আর তাঁর বর্ণনা শেষ হয় এই শব্দেই: "তাঁর মুখ অতি মধুর, **আর তিনি সর্বাংশে মাহামাদ্দিম**।" এই পাঠকে আল্লাহ ও তাঁর জাতির সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে বোঝা হয়েছে, কিংবা নিছক প্রেমের কবিতা হিসেবে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হিব্রুতে প্রত্যয় **"-ইম"** বহুবচনেরও, আবার মহিমারও — যেমন "এলোহিম", আল্লাহর নাম বহুবচনে অথচ উদ্দেশ্য একজন। আর এই শব্দের হিব্রু ধাতু ח-מ-ד (হ-ম-দ) সেই একই ধাতু যা আরবি হ-ম-দ। আর এখানে "-ইম" প্রামাণ্য বিশ্লেষণে সাধারণ বহুবচন, যেমন একই আয়াতের "মামতাক্কিম"। **আর একটি সীমায় থামুন:** একে "মুহাম্মদ"-এর নাম ধরে পড়া একটি অনুমিত সিদ্ধান্ত, ব্যাকরণের বিধান নয়। আর প্রতিষ্ঠিত এটুকুই যে ধাতুটি আজও হিব্রুতে টিকে আছে, আর অনুবাদগুলো তাকে গলিয়ে দেয়, যাতে পাঠক তা দেখতেই না পান।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দলিলের জোর এখানেই যে ধাতুটি **মূলে টিকে আছে, মুছে ফেলা হয়নি** — সে কেবল অনুবাদে গলে গেছে। আর এমনটা প্রায়ই ঘটে: যেসব ব্যক্তিনাম নিজ ভাষায় অর্থ বহন করে, সেগুলো অনুবাদ হয়ে যায় আর নামটি হারিয়ে যায়। কোনো আরবি পাঠে যদি "আবদুল্লাহ" নামটি থাকত, তার অনুবাদ হতো "আল্লাহর বান্দা" আর ব্যক্তিটি উধাও হয়ে যেত। কুরআন জানিয়েছে যে তাঁর নাম ﷺ তাদের কাছে লিখিত আছে: "**যারা অনুসরণ করে সেই রাসুলের, সেই নিরক্ষর নবির, যাঁকে তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইনজিলে লিখিত পায়**", আর এ-ও যে ঈসা সুসংবাদ দিয়েছেন "**আমার পরে আগমনকারী এক রাসুলের, যাঁর নাম আহমদ**"। এ হলো কুরআনের দাবি, আর এই হিব্রু শব্দটি **এমন এক সাক্ষী যা তাকে কাছে নিয়ে আসে** — একা ফয়সালা করে দেওয়া প্রমাণ নয়।

সূত্র *Biblia Hebraica* – Song of Songs 5:16 · Strong's Hebrew 4261 – *mahmad*

মথির সুসমাচার

108 তা তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে অন্য এক জাতিকে দেওয়া হবে

> এজন্য আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, আর এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে যে তার ফল উৎপন্ন করবে।
>
> **মথির সুসমাচার — অধ্যায় 21, আয়াত 43**

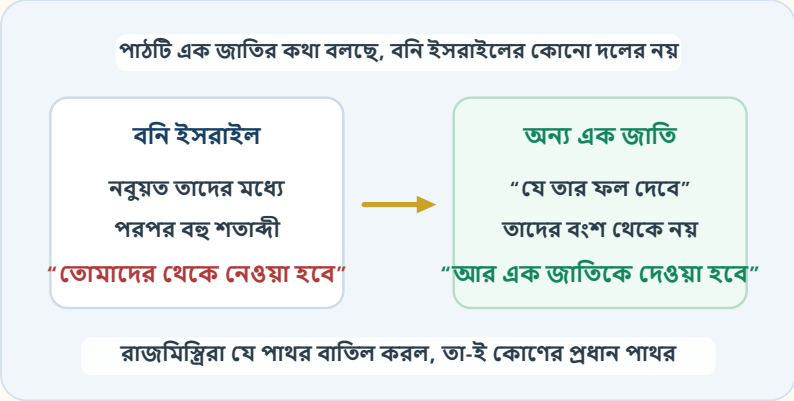

নবুয়তের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সরে যাওয়া — স্বয়ং ইনজিলের পাঠ অনুসারে

সহজ কথায়

মসীহ আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে বললেন যে **আল্লাহর রাজ্য তাদের কাছ থেকে নিয়ে অন্য এক জাতিকে দেওয়া হবে**, যে তা-ই করবে যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে। অর্থাৎ নবুয়ত বনি ইসরাইল থেকে বেরিয়ে অন্যদের কাছে চলে যাবে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

নবুয়ত বনি ইসরাইলের মধ্যে — তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর — শত শত বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন ছিল: ইউসুফ, মূসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল ও অন্যরা। তারা বিশ্বাস করত, নবুয়ত তাদের বংশে সুরক্ষিত এমন এক অধিকার যা কখনো তাদের ছেড়ে যাবে না। এ কারণেই তারা অস্বীকার করেছিল যে আরবদের মধ্য থেকে কোনো নবি প্রেরিত হবেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মুহাম্মদ ﷺ প্রেরিত হয়েছেন **ইসমাঈলের বংশ** থেকে — অর্থাৎ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের অন্য শাখা থেকে। ফলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নবুয়ত ইসহাকের বংশ থেকে ইসমাঈলের বংশে সরে গেল। আর তাঁর হাতে এমন এক নতুন জাতি দাঁড়াল যা আগে ছিলই না, আর যা পৃথিবীর সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। আর কুরআন ঠিক এই জায়গাটিতেই জন্ম নেওয়া হিংসার দিকে ইঙ্গিত করেছে: "**নাকি তারা মানুষকে হিংসা করে সেই অনুগ্রহের জন্য যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন?**"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"জাতি" শব্দটিই নির্ণায়ক। তিনি বলেননি "তোমাদের মধ্যকার কোনো দলকে দেওয়া হবে", বলেননি "কোনো নেক অবশিষ্টাংশকে" — তিনি বলেছেন "**এক জাতিকে**", আর গ্রিকে (এথনোস) এর অর্থ **অন্য এক জনগোষ্ঠী**। এই পাঠের আগে আছে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উপমা, যার শ্রমিকেরা তাদের কাছে পাঠানো বার্তাবাহকদের হত্যা করল, তারপর পুত্রকেও হত্যা করল — ফলে তারা এরই যোগ্য হলো যে তা তাদের কাছ থেকে কেড়ে অন্যদের হাতে দেওয়া হবে। আর ঠিক তার আগেই আসে: "**যে পাথরটি রাজমিস্ত্রিরা বাতিল করেছিল, সেটিই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠেছে**" (আয়াত 42), তারপর কারণবাচক শব্দ দিয়ে তারই ওপর রায়টি শাখা মেলে: "এজন্য আমি তোমাদের বলছি..." (আয়াত 43) — অর্থাৎ বাতিল করা শাখাটির ওপরই দাঁড়াবে ইমারত। আর ইসমাঈলের বংশ নবুয়তের প্রতিটি তালিকায় বাদ পড়ে যাওয়া সেই শাখা — যতক্ষণ না সেখান থেকেই এলেন শেষ নবি।

১০৯ বারোজন সর্দার... আর এক মহাজাতি

আর ইসমাঈলের বিষয়ে, আমি তোমার কথা শুনলাম: দেখো, আমি তাকে বরকত দিয়েছি, আর তাকে ফলবান করব, আর তাকে অতিশয় বৃদ্ধি করব; তার থেকে বারোজন সর্দার জন্মাবে, আর আমি তাকে এক মহাজাতি করব।

আদিপুস্তক — অধ্যায় 17, আয়াত 20

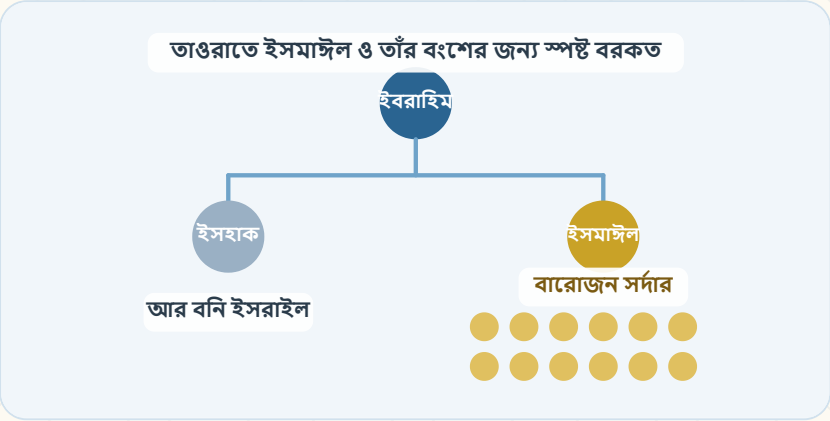

একটি পাঠ যা ইসমাঈলের জন্য বরকত, বংশ আর এক মহাজাতির স্বীকৃতি দেয়

সহজ কথায়

স্বয়ং তাওরাত উল্লেখ করে যে আল্লাহ **ইসমাঈল**-কে বরকত দিয়েছেন, আর ওয়াদা করেছেন যে তাঁর ঔরস থেকে **বারোজন সর্দার** বের হবেন, আর তিনি তাঁকে **এক মহাজাতি** করবেন। সুতরাং বরকত কেবল ইসহাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বনি ইসরাইলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল যে গোটা প্রতিশ্রুতি ইসহাক ও তাঁর বংশেই, আর ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরেরা অঙ্গীকারের বাইরে। এরই ভিত্তিতে আরবদের দিক থেকে আসা যেকোনো ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যাখ্যান করা হতো। কিন্তু পাঠটি ইসমাঈলের জন্য স্বতন্ত্র এক বরকতের স্বীকৃতিতে স্পষ্ট।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ইসমাঈলের বারো ছেলের নাম আদিপুস্তকে (25:13-16) এসেছে, আর তালিকাটি শেষ হয় এই কথায়: "**নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বারোজন সর্দার**" — আর এরাই উত্তর আরবের সুপরিচিত গোত্রগুলো, যাদের কয়েকটির নাম অ্যাসিরীয় শিলালিপিতে এসেছে। আর **এক মহাজাতি**-র ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে ইসলামে: এমন এক জাতি যা ইসমাঈলের বংশ থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর পুব ও পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই পাঠ সেই মূল যুক্তিটিকেই ভেঙে দেয়, যা দিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত প্রত্যাখ্যান করা হতো। স্বয়ং তাওরাত যদি ইসমাঈলের জন্য **বরকত**, **বিশাল বংশ** ও **এক মহাজাতি** স্বীকার করে, তবে তাঁর শাখাকে নবুয়ত থেকে বাদ দেওয়ার কোনো ভিত্তিই থাকে না। আর ওয়াদার ক্রমটি লক্ষ করুন: বরকত, তারপর ফলবান হওয়া ও বৃদ্ধি, তারপর বারোজন সর্দারে নেতৃত্ব, তারপর **"এক মহাজাতি"** — সেই লক্ষ্য, যা দিয়ে এটি শেষ হয়। আর আদিপুস্তক (21:21) জানায় যে ইসমাঈল বসতি করেছিলেন **ফারানের প্রান্তরে** — ঠিক সেই জায়গা, যেখান থেকে দ্বিতীয় বিবরণের পাঠে আলো "ঝলমল করে উঠেছিল"। পাঠগুলো একে অন্যকে সত্যায়ন করে আর একই দিকে ইঙ্গিত করে।

110

একটি তুলনা

মূসার মতো — যে তুলনা ফয়সালা করে দেয়

আর ইসরাইলে মূসার মতো আর কোনো নবী উত্থিত হননি, যাঁকে সদাপ্রভু মুখোমুখি হয়ে জানতেন

দ্বিতীয় বিবরণ — অধ্যায় 34, পদ 10

বৈশিষ্ট্য	মূসা	মুহাম্মদ ﷺ
স্বাভাবিক জন্ম	✓	✓
বাবা ও মা	✓	✓
স্ত্রী ও সন্তান	✓	✓
পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত	✓	✓
নেতা ও যোদ্ধা	✓	✓
নিজ শহর থেকে হিজরত	✓	✓

"তোমার মতো" — তাওরাত অস্বীকার করে যে তিনি বনি ইসরাইলের

সাতটি গুণ, যা দুজনে মেলে, তৃতীয় কারও মধ্যে নয়

সহজ কথায়

তাওরাত **মূসার মতো** একজন নবীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর মিলিয়ে দেখলে সেই গুণগুলো একত্র পাওয়া যায় মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে, অন্য কোনো নবীর মধ্যে নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আহলে কিতাব "মূসার মতো সেই নবী"-র অপেক্ষায় থেকেছে, অথচ তাঁর পরিচয়ে কখনো একমত হতে পারেনি। এ পদের জন্য বনী ইসরাইলের যে নবীর নামই পেশ করা হোক, তাঁর ক্ষেত্রে এক বা একাধিক শর্ত অপূর্ণ থেকে যায়: নতুন কোনো শরিয়ত নেই, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নেই, যুদ্ধও নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মূসা ও মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে মিলের দিকগুলোর অন্তর্ভুক্ত: মা-বাবার ঘরে স্বাভাবিক জন্ম, বিবাহিত জীবন ও সন্তান, **একটি পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত** যা ইবাদত, লেনদেন, বিচার ও দণ্ডবিধি পরিচালনা করে, একটি উম্মতের নেতৃত্ব, জিহাদ ও শাসন, নির্যাতনের দেশ থেকে প্রতিষ্ঠার দেশে **হিজরত**, নিজের জীবদ্দশাতেই শত্রুদের উপর বিজয়, এবং স্বাভাবিক মৃত্যু ও মাটিতে দাফন। মূসার পরে আর কোনো নবীর মধ্যে এ সবগুলো একত্র হয়নি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

তাওরাত নিজেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে: "**আর ইসরাইলে মূসার মতো আর কোনো নবী উত্থিত হননি।**" এটি স্পষ্ট সাক্ষ্য যে প্রতিশ্রুত সেই নবী **বনী ইসরাইলের কেউ নন** — নইলে বাক্যটি নিজেই নিজের বিরোধী হয়ে যেত। আর এর সঙ্গে যখন অধ্যায় 18-এর 18 নম্বর পদের কথাটি মেলানো হয় — "তাদের **ভাইদের** মধ্য থেকে" — তখন সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে: তাদের চাচাতো ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবী, অর্থাৎ ইসমাইলের বংশ থেকে। ইহুদিরা প্রাচীন কালে এটি বুঝত; সে কারণেই কুরআনে এসেছে: "**আর তারা আগে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, অতঃপর তারা যা চিনত তা যখন তাদের কাছে এল, তখন তারা তা অস্বীকার করল**" — অর্থাৎ তারা তাঁর অপেক্ষায় থাকত ও তাঁর সুসংবাদ দিত, যতক্ষণ না তিনি তাদের নিজেদের বংশের বাইরে থেকে এলেন।

অধ্যায়ের সারকথা

১১১ তারা তাঁকে নিজেদের কাছে লিখিত পায়

যারা অনুসরণ করে সেই রাসুলের, উম্মি নবীর, যাঁকে তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইনজিলে লিখিত পায়

সূরা আল-আরাফ — আয়াত 157

কুরআন আহলে কিতাবের নিজেদের হাতে থাকা কিতাবকেই সাক্ষী মানে, কেবল নিজেকে নয়

সহজ কথায়

কুরআন স্পষ্ট করেই বলছে, নবী ﷺ-এর পরিচয় **তাওরাত ও ইনজিলে লেখা আছে** — সেই কিতাবেই, যা আহলে কিতাবের হাতে রয়েছে। এটি তাদের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ: তারা নিজেদের কিতাব খুলে দেখুক।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মদিনা, নাজরান ও ইয়েমেনের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে তাদের কিতাব ছিল এবং তারা তা পড়তও; তাদের মধ্যে এমন আলেমও ছিলেন, যাঁরা এসব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। কাজেই নবী ﷺ-এর পরিচয় তাদের কিতাবে আছে — এ দাবির কোনো ভিত্তি না থাকলে **সেদিনই তা মিথ্যা প্রমাণ করা যেত**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

এইমাত্র যেসব শাস্ত্রবচন গেল — দ্বিতীয় বিবরণ 18 ও 33, হবক্কূক 3, যিশাইয় 21, 29 ও 42, পরমগীত 5, যোহন 14 ও 16, মথি 21, এবং আদিপুস্তক 17 ও 21 — **সবগুলোই আজকের প্রামাণ্য সংস্করণে বিদ্যমান**, যে কোনো পাঠক কিতাব খুলে সেগুলো পড়তে পারেন। আর আয়াতটি এ দাবি করেনি যে প্রতিটি জায়গায় নামটি স্পষ্ট উল্লেখ আছে; বরং বলেছে "**তারা তাঁকে পায়**" — অর্থাৎ তারা তাঁর পরিচয় ও নিদর্শনগুলো পায় এবং তা দিয়েই তাঁকে চিনে নেয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে শক্তিটা ভিন্ন ধরনের। কুরআন নিজের থেকে প্রমাণ আনছে না, বরং **প্রতিপক্ষের নিজের কিতাবের দিকেই ইঙ্গিত করছে**। এটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ধরনের যুক্তি এবং মিথ্যা প্রমাণ করা সবচেয়ে সহজ — তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে নিজেদের কিতাব খুলে দেখিয়ে দিত, সেখানে কিছুই নেই। তবু তাদের যেসব আলেম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ঠিক এ কারণেই করেছেন — যেমন মদিনার ইহুদিদের পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। এরপর কুরআন সাহসে আরও এক ধাপ এগিয়েছে: "**তারা তাঁকে তেমনই চেনে, যেমন নিজেদের সন্তানদের চেনে**" — এমন তুলনা কেবল সে-ই করতে পারে, যে পুরোপুরি নিশ্চিত। আর চৌদ্দ শতাব্দী ধরে এসব বচন তাদের কিতাবে টিকে থাকা, যা গবেষকরা পড়ছেন ও আলোচনা করছেন, নিজেই আজ পর্যন্ত সেই চ্যালেঞ্জের চলমান থাকা।